সৈয়দ শামসুল হকের *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*
ইতিহাস, লোককথা ও মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ একটি প্রধান অনুষজ্ঞ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রচিত *রাইফেল রোটি আওরাত* দিয়ে শুরু করে সে সংখ্যাটি বর্তমান পর্যন্ত একেবারে নগণ্য নয়। সৈয়দ শামসুল হকের (জন্ম.১৯৩৫) নিজেরও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও কয়েকটি উপন্যাস। কারো কারো মতে এ ধারায় *নীলদংশন* (১৯৮১) তাঁর প্রধান কাজ। সন্দেহ নেই *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* প্রকাশের পর সমালোচককে সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস নিয়ে নতুন মূল্যায়নে ব্রতী হতে হবে।

বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ নিয়ে সৈয়দ হকের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের। ১৯৭৯ সালে এটির রচনা শুরু করেন তিনি যা প্রথমে দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরে ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে আলাদা দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপরও অতৃপ্তি ঔপন্যাসিককে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। আর তাই পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজটি চলতে থাকে নিরন্তর। অবশেষে শেষ হয় ১৯৯৮-এ। অখণ্ড কলেবরের পাঁচশ' পৃষ্ঠার এ উপন্যাসটিকে আগেরগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপন্যাস হিসেবে আখ্যা দেয়া যায় সহজেই।

দীর্ঘ এ উপন্যাসের প্রধান পুরুষটি হচ্ছে মহিউদ্দিন। রংপুর জেলার জলেশ্বরীর বাসিন্দা সে। কলেজের এই অধ্যাপকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে নিকটবর্তী অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তাকে আশ্রয় করে *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। মহিউদ্দিন ও তার গেরিলা দলটি বৃষ্টির অপেক্ষায়। সুলতান, আলম, সাত্তার, অনিবাশ, হায়দার, বশীর, আজমত সবাই সে বৃষ্টির অপেক্ষায়। বৃষ্টি আসবে, আধাকোশা নদী ফুলে উঠবে। সাথে সাথে ছোটখাট কয়েকটা খালের কিছু কিছু জায়গা কেটে মিলিয়ে দিতে পারলে জলেশ্বরী হয়ে পড়বে দ্বীপ। আটকে পড়বে পাকিস্তানি বাহিনী। আর তারই অপেক্ষায় মহিউদ্দিনের বাহিনী।

অপেক্ষামান এ বাহিনীর অলস আলোচনায় এক সময় উঠে আসে আর একজনের নাম সে ফুলকি। ফুলকি মহিউদ্দিনের চাচাতো বোন, তার প্রেমিকা এবং ভবিষ্যৎ স্ত্রী। একাত্তরের সতেরো এপ্রিল তারিখে জলেশ্বরীর উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি মিলিটারি রওনা হওয়ার খবর পাওয়া গেল। তখন যুবকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসাধারণকে বেড়িয়ে পড়তে বলে কেননা, শহর ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া এখন আর অন্য কোন উপায় নেই। সে আহবান ফুলকির বাবা সৈয়দ আবদুস সুলতানকেও জানিয়েছিল মহিউদ্দিনরা। কিন্তু হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবুদ্দিনের মাজারের খাদেম সৈয়দ আবদুস সুলতানের সাফ কথা 'না, যাব না। তোমাদের সব পাগলামি, তোমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে, ইন্ডিয়ার সব প্রোপাগান্ডা, দেশের মিলিটারী নিরীহ মানুষ মারতে পারে না। ... এই জলেশ্বরীতে মিলিটারী যদি বন্দুক তোলেও-তাদের বন্দুক থেকে গুলি বেরুবে না। এটা কুতুব শাহের জাগা, বড় মরতবার স্থান' (পৃ. ২৯)। আর এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত ঘটনা এবং কুতুব শাহের স্থানিক লোককথার ভেতর দিয়ে পাঠক প্রবিষ্ট হতে থাকেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি দীর্ঘায়িত পেক্ষাপট এবং বাঙালি মুসলমানের দীর্ঘ অতীতে।

বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে অধিকাংশতই তথ্য-মাধ্যমের উদ্ধৃতির ভেতর দিয়ে। দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা-রেডিও-টেলিভিশন থেকে প্রয়োজনানুযায়ী সংযোজন করে করে সে প্রেক্ষাপট নির্মাণ। হয়তো সে-প্রেক্ষাপটের অনেকাংশই পাঠকের জানা, তবু উপন্যাসের কাহিনী-স্রোতে সেগুলো পড়তে ভালোই লাগে। তাছাড়া সেগুলোর অনুপস্থিতি সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধের চিত্র হতে উপন্যাসটিকে বাধা দিত। *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এর আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবেশন করতে করতে বারে বারে চলে গেছেন ভবিষ্যতে। যে ভবিষ্যৎ ২০০১ সালে অতীত সময় হলেও ১৯৭১ সালে ভবিষ্যৎ। সে ভবিষ্যৎ বিবরণে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু (পৃ. ১০) জাতীয় চার নেতার মৃত্যু (পৃ. ২৮), শহীদ মহিউদ্দিনের নামে জলেশ্বরীতে সড়কের নামকরণ (পৃ. ৪৭) ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক কিছুই দুর্মদবেগে প্রবেশ করতে থাকে। বিশেষভাবে লক্ষ করা যেতে পারে যে লেখক যখন মহিউদ্দিন, তার বংশ, জলেশ্বরী, তার ইতিহাস ইত্যাদিতে পরিক্রমণ করেন তখন সে-সুদূর সময় থেকে এগিয়ে ভবিষ্যতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড সময়কে তার বিবরণে আশ্রয় দেন, যা বাংলা উপন্যাসে বিশেষ অভিনবত্বের দাবিদার।

সারা জলেশ্বরীসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে যার কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত, লোককথায় পরিণত সেই শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের উত্তরসূরী হলো মহিউদ্দিন। কুতুবউদ্দিন হলেন সেই মানুষ যিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারের জন্য জলেশ্বরী এলাকায় আসেন। সালটা ষোলশ এক, আকবর বাদশা তখন দিল্লির সিংহাসনে। কুতুবউদ্দিনের মাজার সারা জলেশ্বরীর মানুষের পবিত্রতম স্থান। আর তাই তাদের বিশ্বাস জলেশ্বরীকে রক্ষা করবে মুক্তিযুদ্ধ নয়, শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের পবিত্র মাজার। কেননা তাদের স্মৃতি এবং শ্রুতিতে এমন অনেক কাহিনীই পাখা মেলেছে যেখানে ঘোরতর বিপদে কুতুবউদ্দিনই রক্ষা করেছেন এ এলাকার মানুষকে।

শাহ কুতুবউদ্দিন এবং তার উত্তরপুরুষদের নিয়ে উপন্যাসে একটি দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত। কীভাবে কুতুবউদ্দিন রাজা ধনদেবের রাজপ্রাসাদের অধিবাসী হলেন, কুতুবউদ্দিনের ছেলে জয়নাল হিন্দু কন্যা মেনকার প্রত্যাশী হলো, হলো পিতৃদ্রোহী ইত্যাদি কাহিনী বহু বিবরণে বারবার স্থান পেয়েছে। বারবার এজন্যই নিশ্চয় যে লোককাহিনীর সত্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত লেখকের নয়। লেখক সেগুলোর পরিবেশক মাত্র, সত্য কাহিনীর আদর্শটি পাঠককেই খুঁজে বের করে দিতে হবে।

শাহ কুতুবউদ্দিনের কাহিনীর ভেতর দিয়ে সব্যসাচী সৈয়দ শামসুল হক প্রকৃতপক্ষে যা করতে যান তা হলো বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের একটি সাহিত্যিক দলিল তৈরি। বিষয়টি কঠিন, পাঠসাধ্য, কল্পনাজাত এবং স্পর্শকাতর। কিন্তু তারপর সৈয়দ হক তাঁর করোটিতে সেটিকে আত্মস্থ করেছেন এবং উপন্যাসে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সফলভাবেই।

কিন্তু *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ যে বিষয়টি তদনুরূপ সফলতা পায় নি তা হলো মুক্তিযুদ্ধকে চিত্রণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাঙালি মুসলমানের যে আত্মিক সংকট সেটির সামগ্রিক বিশ্লেষণ দীর্ঘ হতে হতে ভারত বিভাগ, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদির ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি, যদিও সেটি প্রত্যাশিত ছিল। কেননা, উপন্যাসের কাহিনীর শুরুর কাল থেকেই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের একটি অঙ্গনে স্থাপিত, যা ছিল বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি, যার ভবিষ্যৎ ছিল সকল পাঠকের আকাঙ্ক্ষা।

শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের পর উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্বে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে যে উপকাহিনী তা হলো সৈয়দ জালালউদ্দিনের। সৈয়দ জালালউদ্দিন অর্থাৎ মহিউদ্দিনের বাবা শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের প্রতিভূ। সৈয়দ বংশের ছেলে হয়েও তিনি ইংরেজি শিক্ষায় ব্রতী হন পরিবারের বিরুদ্ধে যেয়ে এবং বড় দৃপ্ত পদক্ষেপে ধর্মীয় কুসংস্কারের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁর সে উদারতার চূড়ান্ত শোনা যাক তাঁর নিজের বিবৃতিতেই : ‘ধর্ম

Bangladeshinovels.com

বিষয়ে আমি গোঁড়াপন্থী নহি। ধর্মান্তরকরণও আমার কাছে বিস্ময়ের বা অপূর্ব কোন ব্যাপার নহে। মানব ইতিহাসে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের কথাই বলি - কেহ বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিবে না যে, সৃষ্টির আদি হইতেই তাহারা এক ধর্মে স্থিত ছিল; বঙ্গদেশে তো অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দু হইতে ধর্মান্তকরণের ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী' (পৃ. ৪৫২)। কিন্তু স্বজনদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবনাচিন্তা সৈয়দ জালালউদ্দিনকে বিমূঢ় করে তোলে। তিনি দেশান্তরী হন। পথে যোগাযোগ ঘটে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে। পরে ভাসানীর পরামর্শেই কলকাতায় চলে যান এবং রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি তীব্র উচ্চারণ। শুধু সৈয়দ জালালউদ্দিনই নন, মহিউদ্দিনকেও কি ঔপন্যাসিক এ আচরণের উর্ধ্বে স্থাপন করেন নি! মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে মহিউদ্দিন তার পূর্বপুরুষ হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজার অপবিত্র করার পরিকল্পনা করতেও দ্বিধা করে নি। কল্পনায় সে গল্প বানায় কুতুবউদ্দিনের নিজের সকল হীরে জহরত মণিমুক্তা এক আলখাল্লার পরতে পরতে সেলাই করে রেখেছিল যেটি এখনও কবরেই রয়েছে। এ গল্প প্রচারিত হলে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেগুলো দখলের লোভে মাজার ভেঙ্গে ফেলবে, আর জলেশ্বরীর মানুষ বুঝবে ওরা ইসলামকে রক্ষা করতে নয়, ধ্বংস করতেই এসেছে এবং এক পর্যায়ে সমবেতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে পাকিস্তানি সৈন্যদের উপর। অন্য আর এক আলোচনায় লেখক ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বলতে আবুল মনসুর আহমদ প্রসঙ্গে বলেন,

বাংলার পীর ও হুজুরদের কীর্তিকলাপ নিয়ে তিনি 'হুজুর কেবলা' নামে যে অবিস্মরণীয় গল্প লেখেন, আজ সে গল্প স্বাধীন বাংলাদেশে কেউ লিখলে তার প্রাণ সংশয় ঘটত... বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যদি আবুল মনসুর আহমদ বেঁচে থাকতেন এবং এই গল্পটি লেখার কথা ভাবতেন, তবে তাঁর কলমের কালি শুকিয়ে যেত জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীদের ভয়ে; অথবা আমাদের অনেক সাহসী লেখকের মতো তিনি লিখতেন, যে কোন সম্পাদকই তা ছাপতে ভয় পেতেন এবং জানাতেন-আহ, কী দুঃখের কথা, আপনার লেখাটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি (পৃ.৪৬৭-৪৬৮)।

ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে এমন ভাবনা-চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে লোকসংস্কারের বিশ্লেষণও কিন্তু করা হয়েছে উপন্যাসটিতে। লোককথার বিবরণের ভেতর এ বিশ্লেষণ লেখকের বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়ই তুলে ধরে। কোন বিশেষ গাছের গুঁড়িতে কুড়োল মারায় একজন গলায় রক্ত উঠে মারা গিয়েছিল (পৃ. ৫১) নিয়ে লেখকের স্পষ্ট ভাষ্য 'লোকটি কুড়াল মারবার মতো কঠিন পেশী চালনার ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি, হয়তো ছিল তার যক্ষ্মা, গলা দিয়ে রক্ত উঠেছে, কিন্তু লোকেরা মনে করেছে সে আঘাত করেছে কোন দেব কিম্বা অপদেব স্থানে, তাই তার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে' (ঐ)। অথবা সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের বংশের উত্তরসূরি হিসেবে তাদের সবার বুকের মধ্যে সবসময় 'আল্লাহু' ধ্বনি হয় এমন ভাবনাকে তার বাবা প্রমাণ করলে বড় হয়ে মহিউদ্দিনের মনে হয়েছে 'আসলে সে রাতে তার বাবাই ঠোঁট চেপে কণ্ঠের ভেতরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছিলেন, আর সেটাই সে হৃৎপিণ্ডের খবর বলে ধরে নিয়েছিল; সম্ভবত তার বাবাও সচেতন ছিলেন না যে, কিভাবে তিনি উচ্চারণ সৃষ্টি করেছেন' (পৃ. ৫৬) এমনই অনেকগুলোর আর একটি উদাহরণ হলো কুতুবউদ্দিনের কার্যকলাপ নিয়ে মহিউদ্দিনের ভাবনা। লেখক বলেন, 'মহিউদ্দিন বিশ্বাস করে না, কুতুবউদ্দিন জায়নামাজে ভেসে রাজা ধনদেবের রাজধানী মান্দারবাড়ি যান। মহিউদ্দিন বিশ্বাস করে না, তার এই আদি পূর্ব পুরুষ যে সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল ফেরেশতারা' (পৃ. ৮১)।

সন্দেহ নেই ইতিহাস ও লোককাহিনীর ঔপন্যাসিক রূপায়ণে *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* একটি বিশিষ্ট সংযোজন। সে বিশিষ্টতা লেখক অর্জন করেছেন তাঁর বিশাল পাঠ, বিপুল কল্পনাশক্তি এবং নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কিন্তু তাই বলে উপন্যাসের পারিবারিক ঘটনাবলিও কম প্রতিকী নয়। মহিউদ্দিন, তাঁর মা শামসি বেগম, ফুলকি, ফুলকির মা হেনা সবাই খুব বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে গ্রন্থে। মহিউদ্দিন-ফুলকির প্রেমগত অতীত যথেষ্ট

প্রতীতি নিয়েই উপস্থাপিত হয়েছে। ফুলকির সুন্দরী মার সাথে বিবাহ-পূর্বকালে সৈয়দ আবদুস সোবহানের সম্পর্কও উপন্যাসের মূল কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

আর মুক্তিযুদ্ধ? প্রত্যাশিত ব্যাপকতায় উপস্থাপিত হতে না পারলেও এর পরিধি একেবারে নগণ্য নয়। বকচরে অন্তরীণ অবস্থানকালে মহিউদ্দিন ও তার সহযোদ্ধাদের কাছে বারবার ফিরে এসেছেন লেখক। মহিউদ্দিন কুতুবউদ্দিনের মাজার নিয়ে যে পরিকল্পনা করেছিল তা বাস্তবায়নে মাজারে হীরা-জহরতের গল্পটি প্রচার করার কাজে বশীরকে পাঠিয়েছিল জলেশ্বরীতে। সেখানে গল্পটি প্রচার করার কাজে ফুলকির বাবা মাজারের খাদেম সৈয়দ আবদুস সুলতানকে রাজি করাতে না পেরে মাজার সংলগ্ন গাথক বাসিন্দা কানা ট্যাংড়ার কাছে যায় বশীর। আর এসময় উন্মোচিত হতে থাকে জলেশ্বরীতে পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকান্ড। বকচরের পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে লুকিয়ে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হলে যে কৃষক মারা যায় তার মেয়ে মোমেনা আস্তে আস্তে কাছাকাছি এসে পড়ে মহিউদ্দিনদের। যোগাযোগ ঘটে মান্দার বাড়ির মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের সাথে। জলেশ্বরীকে দ্বীপ বানিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য কাবু করার মহিউদ্দিনের পরিকল্পনায় অংশীদার হওয়ার জন্যই আকবর হোসেনের আসা। আকবরই জানায়, মহিউদ্দিনের চাচা আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আবদুস সোবহান চান মহিউদ্দিন কলকাতায় চলে যাক, সমরক্ষেত্রে সরাসরি অবস্থান তার জন্য আবশ্যিক নয়। এমন সময়ে রাজাকার কর্তৃক পিশু নানাকে, যে কিনা বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতো, আটকে রাখার খবর নিয়ে আসে মোমেনা। রাজাকার নির্মূলের সে অভিযানে মৃত্যু হয় মোমেনার।

মুক্তিযুদ্ধ-সম্পৃক্ত স্থানিক এ কাহিনীগুলোর ভেতর দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক সঞ্চালন করছেন সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য, ভাষ্য ও কাহিনী। আর সেভাবেই বঙ্গবন্ধু তথা সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের প্লটকে আশ্রয় করে। এবং ঔপন্যাসিকের সাফল্য এই যে তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে পাশাপাশি উপস্থাপন করতে পেরেছেন বহু মত ও বিতর্ক উৎসারী প্রশ্নগুলো। মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের একক প্রতিনিধিত্ব, মুজিব বাহিনী গঠন, অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো লেখক সন্নিবেশ করেছেন সহজাত দার্ঢ্যে।

শৈলীগত দিক থেকেও *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* আলোচনার দাবিদার। সর্বদ্রষ্টা লেখকের সাথে সাথে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এত অধিক বক্তার মুখ দিয়ে যে বাংলা উপন্যাসে তেমনটি সম্ভবত অতীতে কোন উপন্যাসে দেখা যায় নি। বক্তা-চরিত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য মহিউদ্দিন নিজে, ফুলকি, বশীর, সৈয়দ আবদুস সোবহান, সৈয়দ আবদুস সুলতান, সৈয়দ জালালউদ্দিন প্রমুখ। দলিল-দস্তাবেজ, পত্র-পত্রিকা, এমনকি জালালউদ্দিনের ডায়েরি থেকে কাহিনীর বিকাশ ঘটে থাকে যথেষ্ট। লোককথা ও কল্পনার মিশ্রণ এ উপন্যাসের বিবরণ-প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর তাই শাহ কুতুবউদ্দিনের কাহিনী যখন মহিউদ্দিনের মুখে বিবৃত হয় তখন 'আমি দেখতে পাই', 'আমি এটাও ভাবতে পারি', 'আমি কানে শুনতে পাই' 'আমি ভাবতে চাই', 'আমি কল্পনা করতে পারি', 'আমি ধরে নিই' (পৃ. ৮১-৮৪) জাতীয় বাক্যপুঞ্জ বক্তার মুখ থেকে সহজেই বেরিয়ে আসে। যেমন জলেশ্বরীতে সেই অতীতে ইসলাম প্রচারের প্রসঙ্গে লেখকের বিবরণে বারবার আসতে থাকে তারা 'প্রত্যক্ষ করেছে ও করবে যে' ব্যাক্যাংশ (পৃ. ৭১)। আবার বিবরণে কখনও কখনও গৃহীত হয় শব্দপুঞ্জ 'আবার কারো কারো ধারণা', 'আবার অনেকে বলে' (পৃ. ৪২৮) ইত্যাদি। এভাবেই পাঁচশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ বিবরণের এই উপন্যাসে লেখক যেমন বারবার অতীত থেকে সুদূর অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে পরবর্তী ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত করেন তার কল্পনাকে, তেমনি তাঁর বিবরণেও আনেন অভিনবত্ব।

এ কথা সত্য যে বর্ণনাকারীর ভূমিকায় বহু ব্যক্তির এই যে অবস্থান বা দলিল-দস্তাবেজ-ডায়েরি থেকেও কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তা *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ প্রথম নয়। ১৯৮৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত

Bangladeshinovels.com

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বহুল আলোচিত উপন্যাস *অলীক মানুষ*-এও এমন বিবরণের পরাকাষ্ঠা আমরা দেখেছি। কিন্তু তারপরও বর্তমান আলোচ্য উপন্যাস উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে *অলীক মানুষ*-এর প্রায় দ্বিগুণ কলেবর গ্রহণ করেও *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ বিবরণ শিথিল হয়ে যায় নি। যদিও একটি বিষয়কে কোন যৌক্তিকতাতেই বর্তমান আলোচক স্থাপিত করতে পারেন নি তাহলো মাঝে মাঝেই কিছু বিরতি দিয়ে দিয়ে ছাপাতে বাঁকা হরফ ব্যবহার। কখনও মনে হয় অতীত বিবরণ, কখনও মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ আবার কখনও অন্য কোন কিছুকে লেখক এভাবে বাঁকা হরফে প্রকাশ করে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চাইছেন। কিন্তু কিছুতেই সকল বাঁকা হরফকে একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে দাঁড় করানো যায় নি। যেমন তেইশ অধ্যায়ে সৈয়দ আবদুস সুলতান বর্ণনা করছেন কুতুবউদ্দিন পুত্র জয়নালের কথা। চব্বিশ অধ্যায়েও সেই একই বক্তা একই উপকাহিনীর পরবর্তী অংশ বর্ণনা করলেও সেটি সোজা হরফে হয়েছে।

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস সংখ্যা পঞ্চাশের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, যদিও এ সংখ্যাটি লেখককে তাঁর মর্যাদা থেকে সরিয়ে দিতে চায় সহজেই। এবং সৈয়দ হকই হয়তো সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের একমাত্র সেবক যাঁর জন্য 'পঞ্চাশ' সংখ্যাটি তুচ্ছ জনপ্রিয়তার সারিতে তাঁকে ফেলে দেয় না। জীবনের বহু বিচিত্র বিষয় তাঁর উপন্যাসে এসেছে এবং সেগুলো এসেছে যথেষ্ট অভিনবত্ব নিয়ে। প্রকাশভঙ্গি, বিশ্লেষণ, বিবরণ, দৃষ্টিভঙ্গি সকল ব্যাপারেই নতুন নতুন উপন্যাসে নতুন নতুন মাত্রা স্পর্শ তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের স্থায়ী আসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে চলেছে। *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* হয়তো সকল বিচারে একটি সফল প্রচেষ্টা হিসেবে সকল পাঠকের কাছে গৃহীত হবে না, কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য একটি প্রয়াস হিসেবে এ উপন্যাস যে মেধার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দৈনিক *সংবাদ*-এ ২১ জুন ২০০১-এ প্রকাশিত।